অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। ড. হাছানুজ্জামান – আমার শিক্ষা গুরু ।।

বছর চারেক আগের কথা। দেশ থেকে বন্ধুসহকর্মী খন্দকার এনামুল কবীর বললেন তাঁরা ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামানের গবেষণা এবং অবদানের উপর একটি বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন যেখানে তাঁকে নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ থাকছে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, সহকর্মীদের। কবীর সাহেব আমাকেও কিছু লিখতে বললেন। লিখলাম। তা ছাপা হলো। বইটির একটি কপিও আমাকে পাঠালেন। নিজে খুব তৃপ্তি পেলাম আমার একজন প্রিয় মানুষ, একজন প্রিয় শিক্ষাগুরুকে নিয়ে দু'একটা কথা বলতে পেরে।

ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান কৃষিবিদদের অগ্রসৈনিক। বটগাছ। বলতে গেলে যে দুজন কৃষিবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাগুরুর হাতে বাংলাদেশের কৃষি, কৃষি গবেষণা এবং কৃষিবিদদের অগ্রগতি, আজকের অবস্থান মানমর্যাদা - তাঁদের একজন ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান অপরজন ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। গত ৯ অক্টোবর রোববার আমার শিক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় জামান স্যার ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। খুব খারাপ লেগেছে । ব্যথিত হয়েছি। কষ্ট পেয়েছি। ঘুরে ফিরে তাঁকে নিয়ে আমার সেই পুরোনো লেখাটা বার বার পড়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছি। আমার লেখার শেষ লাইন দুটি ছিলো "এমন এক খেয়ালী বিজ্ঞানী, সাধক পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি ধন্য। তাঁর কাছে আমার ঋনের নেই শেষ। করুণাময় তাঁকে সুস্থ রাখুন। দীর্ঘায়ূ করুন।" সে আয়ূটাই ফুরিয়ে গেলো। তিনি চলে গেলেন।

বসেছি তাঁকে নিয়ে কিছু লিখবো বলে। কিন্তু কিছুই যেন আর লিখতে পারছি না। অবশেষে স্থির করলাম সে লেখাটাই আমার কলামের পাঠকদের জন্য তুলে দেবো। আমার হারিয়ে যাওয়া শিক্ষাগুরুর সাথে পরিচয়টা অন্তত হবে। সেটাই হোক আমার আজকের অল্প-স্বল্প গল্প।

ড. হাছানুজ্জামান - আমার শিক্ষা গুরু

১৯৭৭-এর শেষ দিনেই আমার নতুন দিনের প্রথম সকাল। ফার্মগেট থেকে সে সময়ের 'দ্রুতযান' - এ (মুড়ির টিনে) জয়দেবপুর চলেছি। জয়দেবপুর তখনো গাজীপুর জেলা হয়নি। আমার নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবো। দূরু দুরু বুক। কি হয় কি হয়! মানুষ নাকি প্রথম প্রেম প্রথম চাকরী আর স্বজন হারাবার প্রথম ধাক্কা সহজে ভুলতে পারে না। মুড়ির টিনটা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সামনে থামতেই ডানে চোখ মেলে দেখি অপরূপ সুন্দরের এক প্রতিমা যেন দাঁড়িয়ে। চারিদিকে পরিচ্ছন্ন সবুজ ধান ক্ষেত। বিভিন্ন ধরণের গবেষণা সংকেত সম্বলিত লেবেল লাগানো। তার মাঝে নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ। নীল দিগন্ত। আমি প্রেমে বিভোর। চোখ সরে না। কন্ডাক্টার বললো - কি অইলো স্যার নামেন না। এইডাই তো ধান গবেষণা। ছোকরাটা বুঝলো না প্রেম আর কাংখিত চাকরীর ভালোলাগা মিলেমিশে কেমন করে অশ্রুবিন্দুর সৃষ্টি হয়। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাস থেকে নেমে গেলাম। ছোকরাটা মুচকি একটা হাসি দিয়ে বাসে সজোরে দুটো বাড়ি দিয়ে বললো - যান যান আগে বাড়েন।

আমি ফটকের সামনে দিয়ে আগে বাড়ছি। মান্নাদের প্রিয় গানটা মনের মাঝে গুনগুনিয়ে উঠলো - 'এই এতো আলো এতো আকাশ আগে দেখিনি -----'। অফিসের গাড়ী বারান্দায় সাদা ফোর্ড ফ্যালকনটা দাঁড়িয়ে একজন কারিগরের অপেক্ষায়। যে কারিগর তিল তিল ঘাম শ্রম আর ভালোবাসা দিয়ে গড়েছেন এই গবেষণার শান্তিনিকেতন। আরেকটু এগিয়ে যেতেই সেই চেনা সিগারের গন্ধ। যে গন্ধে ফিদেলকে চেনা যায়। এখানে সেই গন্ধেই এই গবেষণার শান্তিনিকেতনে আমাদের ফিদেলকে খুঁজে পাওয়া যেতো। ব্রি-র প্রধান কারিগর, সৌন্দর্য্যের প্রতিমা গড়ার কারিগর, বিজ্ঞানী গড়ার কারিগর, ধান চাষীর মুখে হাসি ফোটানোর কারিগর, দরিদ্র কৃষকের মনে সাহস জাগানোর ফিদেল, কৃষি বিজ্ঞানের পুরোধা ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামানকে।

সেদিনই অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর কাজে যোগদান করলাম একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে। প্রশিক্ষণ বিভাগে। তখন এর নাম ছিলো কম্যুনিকেশন ট্রেনিং এ্যান্ড এ্যাপলাইড রিসার্স ডিভিশন। আর বিভাগটির অবস্থানও ছিলো অন্যস্থানে। পুরাতন লাইব্রেরী ঘেঁষে। জামান স্যারকে দেখতাম, নয়তো অনুভব করতাম (সিগারের গন্ধে) তিনি ছুটছেন। ব্যস্ত। মানুষটাকে কখনো বিশ্রাম নিতে দেখিনি। সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের সেই চরণ দাস বাউলের ('কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' স্মর্তব্য) কথা মনে হতো। রাজার সামনে এসে চরণ দাস যেমন বলতো - 'হুজুর যতক্ষণ জান ততক্ষণ গান। গান নাই তো জান নাই'। আমাদের এই বাউল বিজ্ঞানীও যেন তাই - যতক্ষণ জান ততক্ষণ ধান। ধান নাই তো জান নাই। এ বাউল যেন জোর করে নিজেই নিজেকে চেপে ধরে তাঁর অফিস কামরায় নিয়ে যেতেন। ফাইল তো দেখতে হবে। নইলে চাইতেন সর্বক্ষণ মাঠে পড়ে থাকতে। হয় গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা তদারকি নয়তো তাঁর প্রিয় ফুলের বাগান। ফোটোপিরিয়ডিজম নিয়ে বহু কাজ করেছেন কিন্তু ফুলের বাগানে এসে বোধকরি বিধাতার কাছে এটাই প্রার্থণা করতেন - প্রভু আমি চব্বিশটা ঘন্টাই আলো চাই। আমার ফুলেরা আলোয় উদ্ভাসিত হোক। কিন্তু জ্ঞানসাধক এ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অকপটে স্বীকারও করতেন ওই ফুল ফোটার জন্য তার নিকটোপিরিয়ড দরকার। গাছেরও অন্ধকারের প্রয়োজন ফুল ফোটাবার জন্য।

আমার মত চূনোপুঁটির সুযোগ কম হতো তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার তবে প্রশিক্ষন বিভাগে কাজ করতাম বলেই প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তাঁকে পেতাম। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন প্রশিক্ষণ ক্লাসে আসতে বললেই সময়ের ফাঁক ফোঁকড় হাতড়ে বেড়াতেন। কোন কোন সময়ে বলতেন আপনার ট্রেইনিজরা রাতে ক্লাসে আসতে পারবে? ওটাই আপাতত আমার সময়। তাই সই। তবু চাইতাম স্যার একটু সময় দিন। তাঁর সেই ক্লাসে যিনি থাকেননি তাঁকে আমি বোঝাতে পারবো না জ্ঞানের পানসিতে ভ্রমণ যে কি আনন্দের। যাঁরা সে পানসিতে চড়েছেন তাঁরাই জানেন আমি কি বোঝাতে চাইছি। খোশ গল্পের মধ্যে দিয়ে কখন যে রাইস ব্রিডিং, বায়োমেট্রী, ফটোপিরিয়ডিজম, এ্যাগ্রো ইকোলজী পড়িয়ে ফেললেন কেউ উপলব্ধি করতে পারলেন না। প্রশিক্ষনার্থীরা পরদিন বলতেন - আপনারা সব ফেল। এতোদিন ধরে যে সব জিনিষ মাথায় ঢোকাতে পারেননি স্যার এক ক্লাসেই সব পরিষ্কার করে দিলেন। আমি হেসে বলতাম সে জন্যেই তো উনি হাসানুজ্জামান আর আমরা তাঁর শিষ্য।

প্রশিক্ষনার্থীরা জিজ্ঞেস করতেন স্যারের ক্লাস কতক্ষণের? বরাবরের মত বলতাম - স্যারের ক্লাস কখন শুরু হবে বলতে পারবো তবে শেষ কখন হবে তা তিনি নিজেও জানেন না। কেমন করে যে তিন চার ঘন্টা পার হয়ে যেত বোঝাই যেতো না। পড়াবার সময়ে কেউ বিরক্ত করুক (জরুরী টেলিফোন বা ফাইল নিয়ে) সইতে পারতেন না। তবু দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁর পিএ মরহুম আব্দুল বাতেন (করুণাময় তাঁকে জান্নাতবাসি করুন) আমাকে বলতেন - স্যার, খুব জরুরী ফোন মিনিষ্ট্রি থেকে - আপনি একটু স্যারকে বলেন। তাঁকে বলতেই একটা ধমক যে দিতেন। ধমক খেয়ে আমি তাকিয়ে দেখি বাতেন সাহেব ৪০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়েছেন। স্যার ক্লাস শেষে বলতেন - এখন বলেন বাতেন সাহেব কি বলতে এসেছিলো।

ক্লাস শুরু করার প্রথমেই বিরাট করে বোর্ডে লিখতেন - EARN । বলতেন একটা অক্ষর আপনার আর্নিংকে সুসংহত করবে। এই কথা বলে EARN শব্দটির আগে 'L ' লিখে দিতেন। হয়ে যেতো LEARN। বলতেন EARN করতে হলে LEARN করতে হবে। স্যার সব্বাইকে এ উপদেশ দিয়ে অনেক এগিয়ে দিলেন কেবল নিজের উপদেশ নিজে গ্রহণ করার সময় পেলেন না। এখনও এই শেষ বিকেলে এসেও লার্ন করে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর আর্থিক আর্ন তেমন হলো না। তাঁর কাছের মানুষরা জানেন স্যারের তেমন আর্নিং নেই বলেই দৈন্যতার মুখোমুখি হতে হয়েছে কতবার। তবে হ্যাঁ, বাস্তব অর্থে তিনি যে ঈর্ষণীয় শ্রদ্ধা ভালোবাসা সম্মান আর্ন করেছেন তা সবার ভাগ্যে জোটে না।

তাঁর আর্ন হবে কোত্থেকে? নিজেই গুনে শেষ করতে পারবেন না কতবার বিদেশে গেছেন অথচ দেশে ফেরার সময় সঞ্চিত সব অর্থ নিঃশেষ করে বয়ে নিয়ে এসেছেন লব্ধ জ্ঞান, বই পুস্তক আর ব্রি-র ফুলের বাগানের জন্য বীজ। যেখানে যে ফুল পছন্দ তার বীজ তাঁকে আনতেই হবে। বীজ এনে ধরিয়ে দিতেন সুধীর মালীর হাতে। এই হতচ্ছাড়া সে বীজ অযত্নে অবহেলায় নষ্ট করে দিতো নয়তো বিক্রি করে দিতো। স্যারের দুঃখের বোঝা বেড়ে যেতো। আমরা বলেছি স্যার সুধীরকে বরখাস্ত করুন। রেগেমেগে বলতেন কবির সাহেব (তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তা) এখুনি সুধীরকে স্যাক করেন। টেবিলে সুধীরকে স্যাক করার ফাইল। স্যারের কলম আর ওঠে না। সুধীর বহাল তবিয়তেই রয়ে গেলো।

এমনই একজন প্রশাসক। কাওকে শাস্তি দেবার কথা ভাবতে পারতেন না। প্রয়োজনেও না। তবে উপরের নির্দেশে কখনো সখনো বাধ্য হতেন। তাই সকলের প্রিয়ভাজন হতে পারেননি। প্রশাসকরা সবার প্রিয়জন হতে পারে না। এটাই বাস্তব। তবে তাঁর নিন্দুকেরাও এক বাক্যে আজো বলেন মানুষটা সৎ এবং অনন্য শিক্ষা গুরু।

ব্রি-কে আন্তর্জাতিকমানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার নেপথ্যের কারিগর ড. হাছানুজ্জামান। এ কথা ব্রি-র প্রতিটি ইঁট-পাথরও বলবে। ওরা কালের সাক্ষী। ফাঁকা মাঠে একটি ইঁটের উপর আরেকটি ইঁট দিয়ে তিলে তিলে গড়েছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় ব্রি। কি করেননি এ ব্রি-র জন্য। জুতা সেলাই থেকে চন্ডিপাঠ - সবই। কখনো কারিগর, কখনো শ্রমিক, কখনো ফিল্ডম্যান, কখনো গবেষক, কখনো কেরানী, কখনো পরিচালক, কখনো শিক্ষক, কখনো আর্কিটেক্ট আবার কখনো বাগানের মালী। তৈরী করেছেন দেশ ও জাতির জন্য একটি আইকন - বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)। তাইতো এখনো অধিকাংশ বিদেশী রাষ্ট্রীয় মেহমানরা বাংলাদেশে এলে তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্রি-তে আনা হয় যা দেশের গবেষণার মান ও সম্মানকে সমুন্নত করে।

ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান আমার পরিচালক (তখনো মহাপরিচালক পদ ছিলো না) আমি তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা। এর বাইরেও তাঁর সাথে আমার যে ঘনিষ্ঠতা তার হেতু আমরা দুজনেই সাহিত্য সংস্কৃতির পূজারী। সাংস্কৃতিক চর্চ্চায় আমার নেশা ছিলো বুঝতে পেরে নানা সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন। শিল্প সৃষ্টিতে তাঁরও ছিলো নেশা। ব্রি-র নতুন সব বিল্ডিং তৈরী হচ্ছিলো। মিলনায়তনও হলো। তো সেই মিলনায়তনের সামনে স্যার স্কাল্পচার তৈরী করাতে চান। তার ডিজাইন দিলেন কন্ট্রাকটারদের। সংশ্লিষ্ট লোকজনদের। প্রথমত কারোই বোধগম্য হয় না স্যারের ডিজাইন দেখে - আসলে স্যার কি চাইছেন। তাঁরা আমাকে বললেন আপনি কি একটু স্যারকে জিজ্ঞেস করবেন? আমি সাহস করে একদিন বলেই ফেললাম। স্যার মাইক্রোস্কোপে একটি স্লাইড দিয়ে আমাকে বললেন - ওটা কি দেখা যায়? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম স্যার ওটা একটা মায়ের গর্ভের মত কি যেন মনে হচ্ছে। খুশীতে উত্তেজিত হয়ে বললেন - গুড। আপনি ধরতে পেরেছেন। এটা হোল ধানের এমব্রিয়ো। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখলে ওটাকে মায়ের গর্ভের আকৃতির মতন লাগে। কি সাযুজ্য দেখেছেন? এটাই আমি ওখানে বসাতে চাই। আমি অবাক বিস্ময়ে এ বিজ্ঞানীর মুখপানে চেয়ে আছি। সুকুমার সৃষ্টির বিজ্ঞানী। প্রকৃতির জ্ঞান সাধক। শিল্প এবং বিজ্ঞানকে কেমন এক সূতোয় গেঁথে ফেলছেন। সেই থেকেই ব্রি-র মিলনায়তনের সম্মুখে সেই স্কালপ্চার। জানিনা পরবর্তীতে ওটার কোন শৈল্পিক নাম দেয়া হয়েছিলো কিনা।

ব্রি-র বিভিন্ন জনসংযোগ কাজে স্যার আমাকে সম্পৃক্ত করতেন। ভরসাও পেতেন বোধকরি। তাই কোন প্রদর্শনী, ফিল্ড ডে, বিদেশী অতিথির আগমনের ব্যবস্থাপনা এবং তদারকীর বিভিন্ন দায়িত্ব দিতেন বিভিন্ন সময়ে। আর এ কাজগুলো করতে গিয়ে দেখেছি তাঁর রুচিবোধ, শৈল্পিকসত্ত্বার পরিচয়। শিখেছি অনেক। একবার ব্রি-তে কি যেন একটা সম্মেলন হবে। ঘটা করে তার আয়োজন। সাজ সাজ রব। আমরা কতেক কর্মকর্তা মিলে নানা বর্নের ব্যানার ফেষ্টুন দিয়ে ব্রি-কে সাজিয়েছি। ব্যানারে নানান উন্নয়নমূলক শ্লোগান, ছড়া কবিতা স্মরনীয় উক্তি। তার মধ্যে একটি ব্যানারে ছিলো কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ফুলিঙ্গ কাব্যের বিখ্যাত সেই কবিতাটি :

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দুরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

এক সময়ে দেখি স্যার ওই ব্যানারটির সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনযোগে কবিতাটি পড়ছেন। আমি ততক্ষণে স্যারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বললেন আমার প্রিয় কবিতাটি দিয়েছেন খুব ভালো লাগছে। একটা নির্মল ধন্যবাদ দিয়ে স্যার চলে গেলেন। কি এক প্রশান্তি যেন লেগেছিলো তাঁর রোমশ বুকে। আমি স্যারের পথ পানে চেয়ে ভেবেছি কি অপূর্ব মিল কবিতাটির সাথে আমাদের প্রিয় জামান স্যারের। বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে বহু কিছু দেখলেন তারপরও ব্রি-র মাঠে ঘাটে একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু দেখা তাঁর থেমে থাকে না। আজো সেই শিশির বিন্দুর মাঝে স্যার কি যেন খুঁজে ফিরছেন। আমরা অপেক্ষায় আছি কবে তিনি ইউরেকা ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠবেন।

এমন এক খেয়ালী বিজ্ঞানী, সাধক পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য পেয়েছি আমি ধন্য। তাঁর কাছে আমার ঋনের নেই শেষ। করুণাময় তাঁকে সুস্থ রাখুন। দীর্ঘায়ূ করুন।